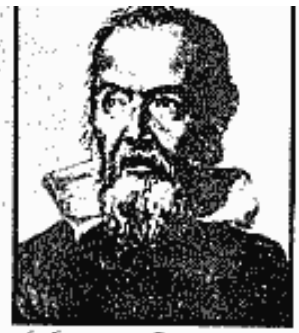

গ্যালিলিও গ্যালিলাই

[১৫৬৪–১৬৪২]

গ্যালিলিও গ্যালিলাই, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাণপুরুষ। গ্যালিলিওর জন্ম ইতালির পিসা শহরে। বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। কিন্তু সঙ্গীত ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তার ছিল গভীর ভালবাসা। গ্যালিলিওর মা ছিলেন উগ্র স্বভাবের মহিলা। সামান্য ব্যাপারেই অন্যের প্রতি রাগ আর বিদ্রূপে ফেটে পড়তেন। পিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ তাঁকে পরিণত করেছিল এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীতে। অন্যদিকে নিজের উগ্র স্বভাব ও সহনশীলতার অভাবের জন্য চারপাশে গড়ে তুলেছিলেন অসংখ্য শত্রু যা তাঁর অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের জন্য আংশিক দায়ী।

ছেলেবেলা থেকেই গ্যালিলিওর মধ্যে প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল। বিচিত্র বিষয়ের প্রতি তাঁর ছিল কৌতূহল। Vallombrosa—র ধর্মীয় পড়তে পড়তে সেখানকার ধর্মীয় শিক্ষকদের প্রভাবে তিনি স্থির করলেন যাজকের পথই জীবনে গ্রহণ করবেন।

যখন সময় পান পুঁথিপত্র নিয়ে বসেন। বিশেষ করে অঙ্ক। এক এক সময় অঙ্ক কষতে কষতে ব্যবসার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যেতেন।

গ্যালিলিওর বাবা তাঁর এই পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন যে পথে নিশ্চিত অর্থ উপার্জনের সুযোগ আছে, তাতেই ছেলেকে ভর্তি করবেন। গ্যালিলিওর ইচ্ছা ছিল অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করা। পিতার আদেশে ডাক্তারি পড়ার জন্য তিনি ভর্তি হলেন পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে শিক্ষকদের প্রতিটি কথাকেই তিনি ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে পারলেন না। প্রতিটি ক্লাসে শিক্ষকদের নানান বিষয়ে প্রশ্ন করে বিব্রত করে তুলতেন। কিন্তু তাতেও তাঁর মন সন্তুষ্ট হল না। নিজের ছোট্ট ঘরে গড়ে তুললেন একটা পরীক্ষাগার। অতীতের প্রতিটি ধ্যান-ধারণাকে বিচার করতেন, বিশ্লেষণ করে দেখতেন তার মধ্যে কতটা সত্য আর কতটুকু মিথ্যে।

এই সময় গ্যালিলিও পরিচিত হলেন তার পিতার বন্ধু রিচির সাথে। রিচি ছিলেন ইতালির রাজপরিবারের অঙ্কের শিক্ষক। গ্যালিলিও তখন পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, বয়স ১৯। একদিন গ্যালিলিও রিচির বাড়িতে গিয়েছেন, রিচি তখন তার ঘরের মধ্যে ছাত্রদের ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়াচ্ছিলেন। গ্যালিলিও ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে শুনতে লাগলেন তার বক্তৃতা। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেলেন। নতুন করে আবার তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠল অঙ্কের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ।

ডাক্তারি বই-এর মধ্যে লুকিয়ে রেখে পড়তে আরম্ভ করলেন ইউক্লিড আর্কিমিডিস। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন রিচি। ডাক্তারিতে আর মন নেই, দিন-রাত চলতে লাগল অঙ্কের চর্চা। এই সময় তাঁর জীবনে ঘটল একটি বিখ্যাত ঘটনা।

একদিন তিনি আরো অনেকের সাথে পিসার ক্যাথিড্রালে বসে প্রার্থনা করছিলেন।সেই ক্যাথিড্রালের মাঝখানে ছিল একটা বিরাট ঝাড়লণ্ঠন। একজন কর্মচারী তাতে প্রদীপ জ্বালাবার সময় অন্যমনস্কভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রতিবার ঝাড়লণ্ঠন দোলবার সাথে সাথে তার ঘর্ষণের আওয়াজ হতে থাকে। গ্যালিলিও লক্ষ্য করলেন ক্রমশই ঝাড়লণ্ঠন দুলুনি কমে আসছে। কিন্তু প্রতিটি দুলুনির সাথে সাথে যে ঘর্ষণের আওয়াজ হচ্ছে, তার গতি এক রয়ে গিয়েছে। ডাক্তাররা যে ভাবে নাড়ী দেখে সেই ভাবে একদৃষ্টে দেখতে লাগলেন ঝাড়লণ্ঠনের দোলন। ক্রমশই তিনি উপলব্ধি করলেন ঝাড়লণ্ঠনের দোলানির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ছন্দ আছে। এর থেকে তিনি আবিষ্কার করলেন পেন্ডুলাম। গ্যালিলিওর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে এই নক্সা দেখে তৈরি করেছিলেন পেন্ডুলাম ঘড়ি।

বাধ্য হয়েই তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হল আর তাঁর ডাক্তারি ডিগ্রী নেওয়া হল না। তিনি ফিরে এলেন ফ্লোরেন্সে।

এবার আর ডাক্তারী পরক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চিন্তা নেই। শুরু হল পদার্থবিদ্যা আর অঙ্কশাস্ত্রের গভীর অনুশীলন। যেমন নিষ্ঠা করতে লাগলেন যদি কোথাও অধ্যাপনার চাকরি পাওয়া যায়। এই সময়ে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের শিক্ষকের একটি পদ খালি ছিল। মাইনে মাত্র কুড়ি শিলিং। তবুও সানন্দে সেই পদ গ্রহণ করলেন গ্যালিলিও। তখন তিনি পঁচিশ বছরের এক তরুণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় পা রাখতেই গ্যালিলিও দেখলেন যে দিকেই তাকান শুধু অ্যারিস্টটল আর অ্যারিস্টটল। তিনি যা কিছু বলে গিয়েছেন তাই সত্য, তাকে নিয়ে ভাবনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু গ্যালিলিও তাঁর অনেক কিছুই মানতে পারলেন না।

অনেকে তাঁকে বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করল, অনেকে তাঁর স্পর্ধা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, "দুটি জিনিসকে উপর থেকে একই সঙ্গে ফেললে ভারী জিনিসটি আগে পড়বে, হালকা জিনিসটি পরে মাটি স্পর্শ করবে"–অ্যারিস্টটলের এই তথ্য ভুল। প্রকৃতপক্ষে দুটি জিনিস একই সঙ্গে পড়বে।

গ্যালিলিও বললেন, আমি সকলের সামনে প্রমাণ করব আমার বক্তব্যের সত্যতা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, শহরের সমস্ত জ্ঞানী-গুণী মানুষদের সাথে নিয়ে গ্যালিলিও এলেন পিসার খ্যাতি হেলানো টাওয়ারের সামনে। কয়েকজনকে নিয়ে তিনি উঠে গেলেন টাওয়ারে মাথায়। এক হাতে দশ পাউন্ডের বল অন্য হাতে এক পাউন্ডের বল একই সাথে মাটি স্পর্শ করল। গ্যালিলিওর সিদ্ধান্ত সঠিক বলে প্রমাণিত হল। তবুও অনেকে মানতে পারলেন না। তারা প্রচার করতে লাগলেন এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কারসাজি ছিল।

পিসার ডিউকের পুত্র রাজকুমার ডন জিওভান্নি ছিলেন ইনজিনিয়ার। তিনি একটা যন্ত্র তৈরি করেছিলেন স্থানীয় বন্দরের পলি পরিষ্কার করবার জন্য। ডিউক যন্ত্রটি পরীক্ষার জন্য গ্যালিলিওর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সব দেখে শুনে গ্যালিলিও বললেন যন্ত্রটি কাজের অনুপযুক্ত। জিওভান্নি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। অন্য সকলের সাথে তিনিও চাইলেন গ্যালিলিওর বিতাড়ন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য হলেও গ্যালিলিও।

গ্যালিলিওর কয়েকজন বন্ধু অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের সাহায্যে তিনি পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক পদ পেলেন (১৫৯২) মাইনে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি। সবচেয়ে বড় কথা এখানে তিনি পেলেন বিদ্যাচর্চার আদর্শ পরিবেশ। এখানে গ্যালিলিও শুরু করলেন তাঁর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রচনা করলেন একাধিক প্রবন্ধ। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল সমস্ত ইউরোপে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর মাইনে আরো বাড়িয়ে দিলেন। ছাত্রদের ভিড় সামলাবার জন্য তিনি বিরাট একটি বাড়ি ভাড়া নিলেন।

মাঝে মাঝে সব ছেড়ে দিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতেন শহরের উপকণ্ঠে সমাজ পরিত্যক্তা এক রমণীর কাছে। তার নাম মারিনা গাম্বা। কিছুদিন পর তাকে নিজের গৃহে নিয়ে আসেন। যদিও তখনো মারিনাকে তিনি বিবাহ করেননি তবুও উত্তরকালে তার গর্ভে গ্যালিলিওর তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল।

এই সময় নানান যন্ত্রপাতি তৈরি করলেন। প্রথমে কম্পাস, এর মধ্যে দিয়ে বোঝালেন পৃথিবীর চুম্বকত্ব শক্তির কথা। তারপর পানি উত্তোলনের জন্য উন্নত ধরনের লিভার। বাতাসের উত্তাপ পরিমাপ করবার জন্য থার্মোমিটার। এই সমস্ত যন্ত্রপাতির ক্রমশই এত চাহিদা বাড়তে থাকে, তিনি বাড়িতে লোক রাখলেন তাঁকে সাহায্য করবার জন্য। এই সব আবিষ্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ কর্তৃপক্ষ তাঁর মাইনে আরো বাড়িয়ে দিল কিন্তু তবুও তাঁর অভাব দূর হল না।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়ে মনোনিবেশ শুরু করেন ১৬০৪ সাল থেকে। এই সময় আকাশে একটি নতুন তারা দেখা গেল। বিভিন্ন লোকের মধ্যে আলোচনা শুরু হল, কেউ বললেন উল্কা, কেউ বললেন নতুন কোন তারা।

গ্যালিলিও কয়েকদিন পর্যবেক্ষণ করে সর্বসমক্ষে তার মত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, এটি কোন গ্রহ নয়, উল্কাও নয়, সৌরমন্ডলে অবস্থিত নিতান্তই একটি তারা। তার এই বক্তৃতা শুনতে দলে দলে লোক এসে হাজির হল।

এরপর তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর। তার সাথে লিখতে লাগলেন গতিতত্ত্ব, বিশ্ব প্রকৃতি, শব্দ আলো রং প্রভৃতি নানান বিষয়ের উপর রচনা।

১৬০৯ সাল। চারধারে গুজব শোনা গেল একজন ডাচ চশমার দোকানের কর্মচারী কাজ করতে করতে এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছে যা দিয়ে নাকি অনেক দূরের জিনিস দেখা যায়।

গ্যালিলিও কথাটি শুনলেন। শুরু হল চিন্তা-ভাবনা। নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর একটি ফাঁকা নলের মধ্যে একটি উত্তল ও একটি অবতল লেন্সকে নির্দিষ্ট দূরত্বে বসাতেই দেখতে পেলেন বহু দূরের বাড়িটি মনে হচ্ছে কয়েক হাতের মধ্যে এসে গিয়েছে। আবিষ্কৃত হল টেলিস্কোপ।

অবশেষে ১৬০৯ সালের ২১শে আগস্ট তিনি সর্বসমক্ষে প্রদর্শনের জন্য টেলিস্কোপ নিয়ে গেলেন ভেনিসের এক উঁচু বাড়ির মাথায়। লোকেরা বিস্ময়ে দেখতে লাগল দু মাইল দূরের সমুদ্র, তাতে ভেসে চলা জাহাজ। আরো দূরের পাহাড়। রাতের আকাশে বড় বড় তারা। চারদিকে আলোড়ন পড়ে গেল। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কৃতিত্বকে সম্বর্ধনা জানিয়ে তাঁকে আজীবন অধ্যাপক পদ দিলেন।

চারদিক থেকে টেলিস্কোপ তৈরির অর্ডার আসতে লাগল। তিনি বাড়িতে কারখানা করে প্রায় ১০০টির মত টেলিস্কোপ তৈরি করলেন। নিজের জন্য তৈরি করলেন অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী একটি টেলিস্কোপ। আকারে আয়তনে এই টেলিস্কোপ অন্য সব টেলিস্কোপের চেয়ে বড়।

বিরাট সেই টেলিস্কোপ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গ্যালিলিও পর্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ করলেন সমস্ত আকাশ। তিনি বললেন চাঁদ একটি উপগ্রহ। তার মধ্যে রয়েছে, ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড় আর গিরিখাদ।

তিনি আবিষ্কার করলেন শনির বলয়। জুপিটারের উপগ্রহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহপুঞ্জ। এই পর্যবেক্ষণ আর আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে তিনি রচনা করলেন প্রথম বই SIDERUS NUNCIUS (The messenger)

এত আবিষ্কার খ্যাতি অর্থ সম্মান পেয়েও কিছুতেই সন্তুষ্ট হলেন না গ্যালিলিও। পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাবার জন্য ডিউকের কাছে আবেদন করলেন।

কিন্তু ডিউক তাঁর আবেদনে কর্ণপাত করলেন না। অবশেষে ডিউক মারা যাবার পর তার পুত্র দ্বিতীয় কসিমো নতুন ডিউক হলেন। তিনি ছিলেন গ্যালিলিওর প্রাক্তন ছাত্র। তিনি গুরুকে আমন্ত্রণ জানালেন। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন, সেই সঙ্গে ডিউকের দর্শন ও অঙ্কের শিক্ষকের পদ পেলেন। ক্লাস করবার বা পিসায় থাকবার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু সাথে সাথে তাঁর জীবনে নেমে এল বিপর্যয়। এর মূল কারণ ছিল কোপার্নিকাসের মতবাদ।

গ্যালিলিওর বহু আগেই ১৫৪৩ সালে পোলান্ডের মহান জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাতে লিখেছিলেন সূর্য স্থির এবং তাকে কেন্দ্র করেই এই পৃথিবী ও অন্য গ্রহগণ আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু যাজক সম্প্রদায়ের ভয়ে এই বই তিনি জীবিতকালে প্রকাশ করতে পারেন নি।

১৬১১ সালে তিনি আবিষ্কার করলেন সূর্যের উপরে কিছু চিহ্ন। তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধু ও অনুরাগীর কাছে তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রথমে প্রকাশ করলেন, কোপার্নিকাসের মতের সমর্থনের প্রকাশ করলেন তাঁর যুক্তি ও অভিমত। ক্রমশই তার সেই ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে। সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল তাঁর শত্রুর সংখ্যা। যে সমস্ত অধ্যাপকরা এতদিন অ্যারিস্টটলের মতের বিশ্বাসী ছিল তাদের মনে হল নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বুঝি এইবার ধ্বংস হয়ে যায়।

এইবার গ্যালিলিও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের কাছে ডেকে প্রথমে তাদের প্রতিটি যুক্তি অভিমত শুনতেন তারপর সামান্য কয়েকটি কথায় তাদের সমস্ত যুক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিতেন। বন্ধুরা অনুভব করতে পারছিলেন গ্যালিলিওর বিপদের দিন ঘনিয়ে আসছে। তারা বারংবার তাকে সাবধান করতে থাকে। কিন্তু গ্যালিলিও কারো কথায় কর্ণপাত করলেন না।

গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতেই ইনইকুইজিশানের পক্ষ থেকে গ্যালিলিওকে ডেকে পাঠানো হল।

২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৬১৬ সালে গ্যালিলিও বিচারকদের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁকে আদেশ দেওয়া হল তিনি সূর্য ও পৃথিবীর সম্বন্ধে যে সব কথা প্রচার করেছেন তা ধর্মবিরুদ্ধে সুতরাং তিনি এই সম্বন্ধে আর কোন বই লিখতে পারবেন না। কোন মত প্রকাশ করতে পারবেন না। এই আদেশ অমান্য করলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

তিনি জানতেন কি ভয়ঙ্কর শাস্তির বোঝা নেমে আসবে তার উপর। গ্যালিলিও তাই অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করে সমস্ত আদেশ মেনে নিলেন।

অপমানিত লাঞ্ছিত ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফ্লোরেন্সে নিজের পরিবারে ফিরে এলেন গ্যালিলিও। গোপনে পুনরায় শুরু করলেন তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। দু-একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া কেউ তাঁর কোন সংবাদই জানতে পারল না।

দীর্ঘ পনেরো বছর পর তিনি রচনা করলেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ। 'বিশ্বের প্রধান দুটি নিয়ম সম্বন্ধে কথোপকথন।'

গ্যালিলিও রোমে গিয়ে পোপের কাছে তা প্রকাশ করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। পোপ কিছু নির্দিষ্ট শর্তে তা প্রকাশ করবার অনুমতি দিলেন।

বইটিতে তিনটি চরিত্র। একজন কোপারনিকাসের মতকে সমর্থন করেছেন, আর একজন টলোমির সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। আর তৃতীয়জন নিরপেক্ষ। প্রথম চরিত্রটি গ্যালিলিওর প্রতিচ্ছায়া। দ্বিতীয় ব্যক্তি সিমপ্লিসিও কিছুটা মজার আর বোকা ধরনের লোক।

১৬৩২ সালে বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিছুদিনের মধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। পণ্ডিতদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হল। অপরদিকে ধর্মীয় সম্প্রদায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তাদের মনে হল ১৬১৬ সালের নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে এই বই রচনা করেছেন গ্যালিলিও মজার চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন।

সাথে সাথে বইয়ের প্রচার বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। বইটির সম্বন্ধে অভিমত দেওয়ার জন্য একটি কমিটি তৈরি করা হল। কমিটি সব কিছু বিচার করে রায় দিল গ্যালিলিও পূর্বের নিষেধাজ্ঞা অবজ্ঞা করে এই বই রচনা করেছেন।

রোমে বিচারসভায় উপস্থিত হবার জন্য গ্যালিলিওকে আদেশ দেওয়া হল। গ্যালিলিও তখন সত্তর বছরের বৃদ্ধ। বাধ্য হয়ে ১৬৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি রোমে এসে হাজির হলেন।

দীর্ঘ চার মাস অন্তরীণ থাকার পর ১৬৩৩ সালের ১২ই এপ্রিল তিনি প্রথম ইনকুইজিশানের সামনে উপস্থিত হলেন। ৩০শে এপ্রিল তিনি দ্বিতীয়বার কোর্টের সামনে এসে হাজির হলেন। কথোপকথন বইটি সম্বন্ধে তাকে জেরা করা হল। তিনি ভয়ে বই-এর কিছু অংশ পরিবর্তন করতে চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হল। কিন্তু পরিবর্তন করার পরও বিচারকরা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না।

জুন মাসের ১৬ তারিখ পোপের সভাপতিত্বে সভা বসল, এতে ঠিক হল যদি গ্যালিলিও তার অপরাধ স্বীকার না করেন তবে তাঁর উপর অত্যাচার করা হবে।

২১তারিখে তাঁকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। শুরু হল তাঁর উপর অত্যাচার। গ্যালিলিও তাঁর শারীরিক মানসিক সব শক্তি হারিয়ে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত সব অভিযোগ স্বীকার করে স্বীকারোক্তি দিলেন।

২২ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে ১৬১৬ সালের নির্দেশ লঙ্ঘন করার জন্য এবং ধর্মবিরুদ্ধ মত প্রকাশ করার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হল। অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দীত্বের আদেশ দেওয়া হল। নির্দেশ দেওয়া হল ভবিষ্যতে তিনি আর কোন বই রচনা করতে পারবেন না।

ডিসেম্বর মাসে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

অবশেষে তার গ্রাম Arcetry-তে যাবার অনুমতি দেওয়া হল।

অসুস্থ শরীরে নতুন উদ্যমে তিনি আবার কাজ শুরু করলেন। এবার সম্পূর্ণ গোপনে রচনা করলেন "দুটি নতুন বিজ্ঞানের বিষয়ে কথোপকথন"। এই বই-এর মধ্যে তিনি তাঁর আগেকার অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা প্রকাশ করেছেন, সেই সঙ্গে বলবিদ্যার মূল তত্ত্বের আলোচনা করেছেন। আইজাক নিউটন পরবর্তী কালে বলবিদ্যার যে সমস্ত সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন, গ্যালিলিও তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—

এই বই ইতালিতে প্রকাশ করবার সাহস হয় না। গোপনে তিনি পাঠিয়ে দিলেন হল্যান্ডে। সেখান থেকে ১৬৩৮ সালে প্রকাশিত হল তাঁর এই অমূল্য সৃষ্টি।

কিন্তু নিজের সৃষ্টি ছাপা অবস্থায় দেখার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। ক্রমশই তার চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। ধীরে ধীরে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেলেন গ্যালিলিও।

জীবনের শেষ পাঁচ বছর তিনি অন্ধ অবস্থায় কাটান। এই সময় তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে ফ্লোরেন্সে যেতে দেওয়া হল। কিছু বাধা-নিষেধ শিথিল করা হল। ইউরোপের অনেক দেশ থেকেই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা তাঁর কাছে, আসতে আরম্ভ করল। গ্যালিলিও তখন অসুস্থ, বিছানায় শয্যাশায়ী।

জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর কাছে এলেন আঠারো বছরের তরুণ ছাত্র ভিভানি। গ্যালিলিওর প্রথম জীবনীকার। তিনি সেবা-যত্নে গ্যালিলিওর শেষ দিনগুলি ভরিয়ে দিয়েছিলেন।

১৬৪২ সালের জানুয়ারি মাসে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে তিনি দু হাতে আঁকড়ে ধরেছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা "The law of Montion" । যা তাঁর মৃত্যুর স্থিতিকে অতিক্রম করে পৌঁছে দিয়েছিল জীবনের অনন্ত পতিতে।